স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় সমাজতন্ত্র

ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী, তার কারণ এই নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' - এই হিসাবে। ... অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, সেইটাই ভাল।"

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমাজতন্ত্র

ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমাজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে সব দেশের সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে এই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ খুব বেড়ে গিয়েছিল। শোষণ বঞ্চনা তুঙ্গে উঠেছিল। সে সময়ে তাই সেখানে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে সমাজতন্ত্র একটি বহু আলোচিত বিষয়। তাঁরা অনেকে সমাজতন্ত্রের অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সেই সব ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে একটা মূল ভাব ছিল। তা হল সাম্য ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা আনা এবং সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা প্রয়োজন মত ব্যক্তি-মালিকানা তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করা। আর স্বামীজী যেহেতু পাশ্চাত্যের জনৈক ব্যক্তিকে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেখানে তিনি সমাজতন্ত্রের প্রচলিত ধারণাগুলোর ঐ মূল ভাবটির কথাই লিখেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু তিনি নিজে সমাজ-কল্যাণের যে পথের কথা বলেছেন, সেটাতে প্রচলিত সমাজতন্ত্র-ধারণার ভ্রান্তিগুলো অনুপস্থিত। আজ, অতি দ্রুত অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের দিনে, যখন আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে ধনী-দরিদ্রের ভেদ, যখন প্রাচুর্যের অভব্য প্রদর্শনীর সামনে হাজারে হাজারে মারা যাচ্ছে অপুষ্ট শিশুর দল, তখন (সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গটা গণমাধ্যমের কাছে অপাংক্তেয় হলেও) সে পথটার কথা জানা প্রয়োজন।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্র – এই দুটি মতবাদের মূল ভাব ও পার্থক্য স্বামীজী খুব সরল ভাষায় বুঝিয়েছেন, "ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কিনা এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও সুখ একেবারে ত্যাগ করা উচিত কিনা – এই প্রশ্নই

সমাজের অনাদিকালের বিচার্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত ; আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে ইহাই প্রবল-তরঙ্গ-রূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মত ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহারই ইংরাজী নাম 'সোশ্যালিজম্' (Socialism), ব্যক্তিত্ব-সমর্থক মতের নাম 'ইন্ডিভিজুয়ালিজম্' (Individualism)।"

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এইটি যে, স্বামীজী নিজেকে সমাজতন্ত্রী বললেও তিনি কিন্তু সর্বদা ব্যক্তির স্বাধীনতা চেয়েছেন। বলেছেন, "চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা – চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃতপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মতো, উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্য-সমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ ?" বলেছেন, "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন – তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।" আরও বলেছেন, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলো সমাজকে স্বাধীনতা দিয়েছিল, ধর্মকে দেয় নি। তাই সেখানে সমাজের উন্নতি হয়েছে, ধর্মের হয় নি। ভারতে এর ঠিক উল্টোটা হয়েছে। এখানে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা, প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ মত ও পথ বেছে নিতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে ধর্ম ও দর্শনের অতুলনীয় উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ভারতের সমাজ জীবন নানা বিধি নিষেধের বেড়াজালে বাঁধা পড়ে আছে কয়েক হাজার বছর ধরে। তাই সমাজ পেছিয়ে পড়ে আছে। আর সেই জন্যই সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা নেই। সেই জন্যই আমরা বার বার বিদেশী আক্রমণের মুখোমুখি হতে অক্ষম হয়েছি, পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়েছি শতাব্দীর পর শতাব্দী। স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখছেন, "উন্নতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তাই (এদেশে) ধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেহকে (অর্থাৎ সমাজকে) যত প্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্ত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত – সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা, ধর্মে কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে তথায় ধর্ম নিতান্ত অপরিণত এবং সমাজ সুন্দর উন্নত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্য দেশীয় সমাজের চরণ হইতে বন্ধন-শৃঙ্খল ক্রমশঃ দূর হইতেছে, পাশ্চাত্ত্যে ধর্মেরও ঠিক তাহাই হইতেছে।"

সুতরাং স্বামীজীর দৃষ্টিতে সমাজের কাছে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বলি দেওয়া সমাজকল্যাণের উপায় নয়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যখন বুঝবে, সমাজের স্বার্থ ও ব্যক্তির স্বার্থ একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল, তখন সে নিজেই সমাজের ভাল চাইবে। স্বামীজীর কথায়, "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম

দৃষ্টিপাত । স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ, স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ । বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনওমতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব ।" এইটি সমাজচেতনার প্রথম পাঠ ।

ভারতীয় সংবিধানে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শকে গ্রহণ করে আমরা বস্তুতঃ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজ-কল্যাণের সমন্বয় করতে চেয়েছি । একে সফল করতে হলে স্বামীজীর দেওয়া ভাবধারা গ্রহণ করে নতুন প্রজন্মের কাছে "মানুষ" হওয়ার শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে । এই কাজটিকে একটি দেশব্যাপী আন্দোলনের রূপ দিতে চেয়েছিলেন স্বামীজী ।

শোষণের অবসান

সকল সমাজের চিরকালের অর্থনৈতিক শোষণের রূপ ফুটে উঠেছে স্বামীজীর সহজ ভাষায় – "একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগলো – হাত দিয়ে বা বুদ্ধি ক'রে । একদল সেইসব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো । সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগলো, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে । একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে । যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম ক'রে কতকটা আগভাগ নিলে । অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল । যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে ম'লো !! পাহারাওয়ালার নাম হ'ল রাজা, মুটের নাম হল সওদাগর । এ দু-দল কাজ করলে না – ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো । যে জিনিস তৈরি করতে লাগলো, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগলো ।"

এ যুগের ধনতান্ত্রিক শোষণের কথা স্বামীজী স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'বর্তমান ভারত' বইটিতে, "বৈশ্য বলিতেছেন, 'উন্মাদ ! ... এই মুদ্রারূপী অনন্তশক্তিমান্ আমার হস্তে । দেখ, ইঁহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান্ । হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি – ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব । হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য – ইঁহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে । এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইঁহারা আমার মধুক্রম । ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে ? – আমি । যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি ।"

স্বামীজী বলেছেন যে, শ্রমজীবী মানুষের শক্তি সঞ্চয় করার ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপায় হল শিক্ষার প্রসার। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, বৈশ্য শক্তির আধিপত্যের অবসান ঘটবে শূদ্র (শ্রমজীবী) জাগরণের মাধ্যমে। বলেছেন, "শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্ত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" এই পরিবর্তন কি আলোড়নের মধ্যে দিয়ে আসবে, তাও যেন তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল - "আমাদের শ্রমিক সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু তা ঘটবে কি ভয়ংকর আলোড়ন, কি ভয়াবহ সংক্ষোভের মধ্যে দিয়ে !"

কিন্তু স্বামীজীর ধারণায় শোষণ শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হয় না, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও হয় আরও ভয়ঙ্কর রূপে। আর এ সবেরই মূলে আছে মানুষের মন - তার হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা, অর্থলোলুপতা, ক্ষমতালিপ্সা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যারা কর্ণধার, তারাও যদি এগুলো থেকে মুক্ত না হয়, নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাও মানুষের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হবে না। স্বামীজীর কথায়, "তাই রাজনীতির চেয়ে যথার্থ ধর্মের গুরুত্ব বেশী, কারণ তা মানুষের আচরণের মর্মে প্রবেশ করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে।"

মার্ক্সের মতে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলে আছে অর্থনীতি – উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর মালিকানা-সম্পর্ক। স্বামীজীও বলেছেন, সাধারণ মানুষের ওপর ধর্মের কিছু প্রভাব থাকলেও তার জীবন পরিচালনা করে অর্থনীতি। মার্ক্সের মত স্বামীজীও ধর্মের প্রচলিত ধারণাকে আফিঙের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু স্বামীজী জানতেন, মানুষের সমাজে ভাল-মন্দ যা কিছু আছে, তার কারণ মানুষের আচরণ। আর আচরণের মূল কারণ তার চরিত্র বা স্বভাব। অধিকাংশ মানুষ উচ্চ আধ্যাত্মিকতার আদর্শ গ্রহণে অসমর্থ হলেও চরিত্রের পরিবর্তন সকলের পক্ষে সম্ভব ও অপরিহার্য। আর ঠিক এইটিই সাধারণ মানুষের জীবনে যথার্থ ধর্মের ভূমিকা। এই ধর্মই শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয় হওয়া উচিত, যাতে "মানুষ" তৈরী হয়। এইটি না করে শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তন করে উৎপাদন-সম্পর্ক বদলে দিলে শোষণ ও বঞ্চনার অবসান হবে না।

সর্বমানবের একত্বই সাম্যের ভিত্তি

একটু গভীরে গিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, বস্তুতঃ সকল কল্যাণের একমাত্র উপায় হল সর্বমানবের একত্ব উপলব্ধির দিকে এগোনো বা হৃদয় দিয়ে সবার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, সকলকে একেবারে আপন জন বলে আন্তরিক ভাবে অনুভব করা। এই ভাবটা যাদের ভেতরে

একটুখানিও জাগবে, তাদের কাছে সমাজের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবলিদানই হবে জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এমন মানুষই উদাহরণ সৃষ্টি করবে, যথার্থ নেতৃত্ব দেবে, যাতে বহু মানুষ তাদের দেখে কিছুটা এগোতে পারে । এই রকম হলে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা বজায় থাকবে, অথচ তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের জন্য বাঁচবে । এমন "মানুষ" তৈরী করাই যথার্থ সমাজতন্ত্রের পথ ।

স্বামীজী বলেছিলেন, "আজকাল গণতন্ত্র ও সাম্যের কথা সকলেই বলে থাকে, কিন্তু একজন যে আর একজনের সমান, এ-কথা সে জানবে কি করে ? এ জন্য তার থাকা চাই – সবল মস্তিষ্ক এবং আজে-বাজে ধারণা হইতে মুক্ত স্বচ্ছ একটি মন ।" "সামাজিক বা রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ে সফলতার মূল ভিত্তি – মানুষের সততা ।" "রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তন যতই হউক না কেন, মনুষ্য-জীবনের দুঃখকষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না । কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতে পারিলেই সর্ব প্রকার দুঃখকষ্ট ঘুচিবে । যতই শক্তি প্রয়োগ, যতই শাসন প্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন, কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না । আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে ।"

মানুষ মানুষকে আপন করতে না শিখলে শুধু আইনের কড়াকড়ি দিয়ে কোন জাতির প্রবৃত্তিকে ভালোর দিকে বা সকলের কল্যাণের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । এটা বিগত শতকে বহু প্রমাণিত । সোভিয়েত রাশিয়ার পতন থেকে শুরু করে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় প্রায় সর্বত্র যে পরিবর্তন এসেছে, তা সমাজতন্ত্রের 'কানা মামা' রূপটির ব্যর্থতা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপাদন করেছে । কার্ল মার্ক্সের তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক" সমাজতন্ত্রের ধারণায় বোধ হয় সব থেকে বড় অভাব এইটি – তা মানুষের মহিমাকে স্বীকার করে নি, হৃদয়কে জাগানোর ওপর কখনই গুরুত্ব দেয় নি, মানুষের সার্বিক স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে ।

বিশেষ অধিকারের বিলোপই আদর্শ

তবে সমাজের সমস্ত মানুষের অন্তরটা বদলে দেওয়া যাবে, এমন অবাস্তব আশা স্বামীজীর ছিল না । কিন্তু এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘ-মেয়াদী কল্যাণের আর কোনও পথ নেই । এ পথে যেটুকু এগোনো যাবে, সেটুকুই সাম্যের দিকে এগোনো সম্ভব হবে । জগতে কখনও সম্পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে না । মার্ক্সের ধারণায় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হল সাম্য প্রতিষ্ঠা । স্বামীজীর দৃষ্টিতে সেটা অবাস্তব । সম্পূর্ণ সাম্য হলে জগৎটা আর জগৎ থাকবে না, সাম্যাবস্থা ভেঙে গিয়েই জগতের সৃষ্টি । এখানে অসাম্য থাকবেই, বৈচিত্র্য থাকবেই । বুদ্ধি, শক্তি ও

সামর্থ্যে মানুষে মানুষে ভেদ থাকবে, সকলে কখনও সমান হবে না। কিন্তু, স্বামীজীর ভাষায়, "এই বৈচিত্র্যের অর্থ বৈষম্য বা কোন বিশেষ অধিকার নয়।" যেটা সম্ভব, সেটা হল – বিশেষ অধিকারের বিলোপ। অধিকার সকলেরই সমান, কেননা সকলেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, সকলে আমরা স্বরূপতঃ অভিন্ন। এইজন্য স্বামীজী বলেছিলেন, "বেদান্তের লক্ষ্য হল সমস্ত বিশেষ অধিকারের বিলোপ সাধন।"

বেদান্তই সমাজতন্ত্রের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি

পাশ্চাত্য দেশে অনেক কম্যুনিস্ট নেতা স্বামীজীর বেদান্ত আলোচনা শুনে বলেছেন, বেদান্তই তাঁদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি হতে পারে। কেননা জড়বাদের দৃষ্টিতে মানুষ বড়জোর একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীব মাত্র। প্রত্যেকটি মানুষ একটি পৃথক সত্তা, পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন, জড়পিণ্ড দেহমাত্র। সাম্য, সমান অধিকার ও অপরের কল্যাণ চিন্তার আদর্শ নিয়ে তারা কেন চলবে ? কেন তারা শুধু 'যেন তেন প্রকারেণ' স্বার্থসিদ্ধি করে চলবে না ? কেন তারা অপরকে শোষণ করবে না, বঞ্চনা করবে না ? জড়বাদী দর্শনে এর কোনও উত্তর নেই, একেবারেই নেই। এর উত্তর আছে শুধু ভারতবর্ষের বেদান্তের শিক্ষায় - আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে একই বস্তু আছে, চৈতন্য বস্তু আছে। তাই আমরা স্বরূপতঃ এক। তাই সকলের ভালোয় আমার ভালো। আর ভেতরের এই বস্তুটির প্রকাশ ও বিকাশই জীবন, যেটি সব বন্ধনের অতীত, সব ক্ষুদ্রতার অতীত; মুক্তিই তার স্বরূপ। তাই স্বাধীনতাকে খর্ব করলে জীবনের বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ নয়, স্বাধীনতার সদুপযোগের শিক্ষাই সমাজ-কল্যাণের যথার্থ উপায়।

এটিই ভারতের সনাতন বাণী, ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এই জাতীয়তা অবলম্বন করেই ভারত বড় হবে, একে পরিত্যাগ করাটা প্রাণত্যাগের সমতুল্য। মার্ক্সের সমাজতন্ত্রে জাতীয়তার চেতনা স্থান না পেলেও জাতীয়তার গভীর তাৎপর্য আধুনিক ইতিহাস চর্চায় বহু সমর্থিত। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ভারতে সমাজতন্ত্রের ধারণা কার্ল মার্ক্সের কাছ থেকে আসে নি, ভারতের নিজের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে এসেছে। এ প্রসঙ্গে ভাগবতের একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মহর্ষি নারদ স্বয়ং নারায়ণের মুখে শোনা সনাতন ধর্মের মূল কথাটি বোঝাচ্ছেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে -

"অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব।।"

অন্ন ও অন্যান্য সব উৎপন্ন দ্রব্য সকলের মধ্যে ভাগ করে দাও তাদের প্রয়োজন অনুসারে । আর তাদের প্রতি "আত্মবুদ্ধি" – নিজের সঙ্গে অভিন্নতার বোধ রাখবে, "দেবতাবুদ্ধি" – কেউ ছোট নয়, সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ, এই বোধ রাখবে ।

এই অভেদ-বুদ্ধিই স্বামীজীর চিন্তায় সমাজতন্ত্রের একমাত্র ভিত্তিভূমি । আর অভেদ দর্শনই বেদান্তের মূল শিক্ষা, যে কথা এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে শিখিয়েছেন ।